পঞ্চম সংখ্যা

এপ্রিল - জুন, ২০১০

সম্পাদকীয়

পঞ্চম সংখ্যা একটু দেরীতে প্রকাশিত হ'ল। আমাদের কাজটা প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিপরীতে। তাই মানুষের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। ব্যক্তিগত লাভের অঙ্ক সমষ্টিগত লাভের থেকে বেশী হচ্ছে না। স্ব-সহায়ক দলের সদস্যাদের বারে বারে বুঝিয়ে যেতে হচ্ছে। আর এজন্য দক্ষ ও অনুপ্রাণিত কর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

''আমার গ্রাম-কর্মীর'' সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে যোগাযোগ বাড়িয়ে যেতে হ'চ্ছে। তাই এখন জোর দেওয়া হ'চ্ছে ''বিদ্যালয় ভিত্তিক গ্রামোন্নয়নে (School-based Rural Development Programme)। বিদ্যালয় কক্ষ এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য সম্পদ গ্রামের উন্নয়নে ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। সবাই প্রথমে রাজী না হ'লেও দু-একটি বিদ্যালয় এ-প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। পরবর্তী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

সম্পাদক মণ্ডলী

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা: জয়নাল আবেদিন, সুবোধ কুমার দাস, সুকেতু মাইতি, সর্বানী শঙ্কর ঘটক, নিশিকান্ত মাইতি, শ্রীমতি প্রথমা রায়, জবেদ আলি, ভাস্কর চন্দ্র দাস, ড. শান্তনু মিত্র।

পত্রিকা কো-অর্ডিনেটর: গৌতম দাস, সুব্রত কর।

কার্যনিবাহী সম্পাদক: অমলেশ মিশ্র ও প্রবীর মাইতি

সহকারী সম্পাদক: অসিত দাস, প্রিয়েন্দু গিরি, তাপসী জানা, দীপঙ্কর জানা, মোহন দোলুই, মমতা পণ্ডিত, শীর্ষেন্দু দাস।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও সার্কুলেশন: সুধেন্দু চন্দ, উদয় দাস, অনিমা দাস, সোমা দাস।

যোগসূত্র সহায়ক: সাহেবা খাতুন, কৃতিসুন্দর মিশ্র, রবিশংকর দাস।

কম জলে ধান চাষ: গল্প হলেও সত্যি

পরেশ দাস

সাগরদ্বীপের একটি গ্রামের নাম মহেন্দ্রগঞ্জ। গ্রামেরই ছেলে ভোলা। গ্রাম থেকে কোলকাতায় গিয়ে অনেকটা পড়াশোনা করে ফেলার পর ভাবতে থাকে গ্রামের মানুষের জন্য কিছু একটা করতে হবে। একদিন গ্রামের বাজারে গিয়ে দেখল কয়েকজন পরিবেশকর্মী কোলকাতা থেকে একটি তথ্যচিত্রের সিডি নিয়ে গিয়ে কিছু চাষীভাই ও স্থানীয় মানুষদের দেখাচ্ছেন। বিষয় ছিল বিশেষ পদ্ধতিতে অত্যন্ত কম জলে সহজ পদ্ধতিতে ধান চাষ। পরে চাষীদের সঙ্গে তাঁরা ওই বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও করেন। ভোলার বিষয়টি খুব ভালো লেগে গেল। ভোলা পরে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই পদ্ধতিতে ধান চাষের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাল। সেই সঙ্গে একাধিক চাষীভাইকে বোঝাতে লাগল, গতানুগতিক পদ্ধতির থেকে ওই বিশেষ পদ্ধতিতে ধানচাষ করলে চাষী কতটা বেশি লাভবান হবেন। সুতরাং অবিলম্বে নতুন পদ্ধতিতে চাষ শুরু করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন চাষীই নতুন পদ্ধতিতে চাষ করতে রাজি হলেন না। তাই ভোলা তাদের ব্যক্তিগত জমিতে ওই পদ্ধতিতে চাষ করবে বলে মনস্থ করল এবং কাজে নেমেও পড়ল।

বিশেষ এই পদ্ধতিতে ধান চাষ করলে বীজ ও জল লাগে অনেক কম; কম দিনের চারা পাতলা করে লাগাতে হয়; এবং নিয়মিত আগাছা-দমন করতে হয়। এই পদ্ধতিটির নাম ''শ্রী'' বা SRI (System of Rice Intensification) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে চাষ করলে ছ'টি ধাপ মনে রাখতে হবে। তাহলে একদিকে খরচ যেমন কম লাগে, অন্যদিকে ফলন হয় গতানুগতিক পদ্ধতির তুলনায় বেশি। ধাপগুলি হোল—

১) **বীজতলা তৈরি:** জমিতে মাটি, কম্পোষ্ট ও খড়ের টুকরো বা তুষ (৭৫:২০:০৫) দিয়ে কুপিয়ে জমি প্রথমে সমান করে নিতে হবে। বীজগুলি লবণ জলে শোধন করে এবং পরে পরিষ্কার জলে ধুয়ে অঙ্কুরিত করে মাটিতে ছড়িয়ে খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

২) **মূল জমি তৈরি**: জমিতে যাতে প্রয়োজন মত জল দেওয়া ও বের করে দেওয়া যায় তার জন্য জমিটিকে সমান করে নিকাশি নালা রাখতে হবে।

৩) **চারার বয়স**: ৮-১০ দিনের মধ্যে দু'তিন পাতার চারা গাছ রোপণ করতে হবে।

৪) **রোপণ পদ্ধতি**: শেকড় না কেটে ওই চারা সাবধানে তুলে ১০ ইঞ্চি X ১০ ইঞ্চি দূরত্বে এক একটি চারা লাগাতে হবে।

৫) **জলসেচ**: গতানুগতিক পদ্ধতি অনুযায়ী গাছের গোড়ায় জল জমিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে গাছে ফুল (শিস) আসার পর গাছের গোড়ায় জল ২-৩ সেমি ধরে রাখতে হয়।

৬) **আগাছা নিয়ন্ত্রণ**: জমি ভেজা থাকার জন্য গাছের গোড়ায় আগাছার জন্ম হয়। আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত আগাছা তুলে মাটিতেই মিশিয়ে দিলে একদিকে যেমন আগাছা নির্মূল হয়, অন্যদিকে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ভোলা এই সমস্ত পদ্ধতি মেনে ধান চাষ করেছিল মাত্র ১০ কাঠা। ভোলাদের পাশের জমিতে গতানুগতিক প্রথায় চাষ করেছিলেন তাঁদের প্রতিবেশি। শেষে পরিমাপ করে দেখা গেল প্রতিবেশি পুরনো পদ্ধতিতে চাষ করে পেয়েছেন ১০মণ। আর ভোলা ওই একই পরিমাণ জমিতে ধান পেয়েছে ১৫ মণ। অর্থাৎ ভোলা বিঘা প্রতি ৩০ মণ ধান পেয়েছে হিসেব করে জেনে নিল। এই হিসেব সঙ্গে নিয়ে আবার দ্বিতীয়বার গ্রামের চাষীভাইদের ''শ্রী'' পদ্ধতিতে চাষের জন্য বোঝাতে ভোলা বেরিয়ে পড়ল গ্রামের রাস্তায়।

দু'টি শালিকের কাহিনি

শীর্ষেন্দু দাস

''জোড়া শালিক দেখা ভালো, সকালে বিকালে;
বিজোড় হলে কপাল মন্দ মেয়েরাই বলে।''

এটা প্রবাদ। বাস্তবে দু'টি শালিকের দেখা ও তাদের অসহায় মৃত্যু আমাদের জীবনে নতুন এক শিক্ষা দিয়েছে। দিনটি ছিল ২১ মার্চ, ২০০৯ রবিবার। গ্রামের জীব-বৈচিত্র সম্পর্কিত পোকামাড়, পশুপাখি ও আরও অন্যান্য পতঙ্গ কি কি পাওয়া যায় তার অনুসন্ধানের জন্য প্রাণী বিশেষজ্ঞ সি. বি. প্রসাদের নেতৃত্বে এই বিষয়ে আগ্রহী স্কুল-কলেজের একাধিক ছাত্র-ছাত্রী সকাল ন'টায় রওনা দেয় পাখিরালা গ্রামে। উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি, বোলতা, পোকামাকড় প্রভৃতি চেনা ও সংগ্রহ করা। কাজ শেষে সবাই যখন ফুলবাড়ি গ্রামে ফিরছে এমন সময় দেখতে পেল বাস রাস্তার উপর দুটি শালিক খুনসুটি করছে। হঠাৎ একদিক থেকে আসা একটি মিনি বাস সেই শালিক দুটিকে চাপা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাখি দুটির মৃত্যু হয়। ঘটনাটি সকলকেই কষ্ট দেয়। অভিজ্ঞ প্রসাদজী একটু অন্যকিছু ভাবলেন। তিনি ভাবছিলেন যদি কোনভাবে পাখিদুটিকে সংরক্ষণ করা যায় তাহলে কেমন হয়। তিনি সামান্য কিছু উপাদান যেমন কাঠের গুঁড়ো, ফটকিরি, ব্লেড নিয়ে একটি পাখির শরীরের ভেতরের মাংস বের করে শরীরে তুলো ঢুকিয়ে দিলেন। পরে প্রসাদজীর সহযোগিতায় আমরাও অপর পাখিটির ওইরূপ ব্যবস্থা করলাম। পরে পাখিদুটিকে কোলকাতার জু লজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'র দপ্তরে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রসাদজী উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কখনও আবার এমন ঘটনা ঘটে, তবে যেন এই সমস্ত দেহকে সংরক্ষণ করে গ্রামেই একটি ছোট্ট মিউজিয়াম করে সেখানে রেখে দেওয়া হয়। উৎসাহ আর সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে যে গ্রামেও মিউজিয়াম তৈরি করা যায়, সাহেবা, অনিমা'র মত কর্মীরা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

চন্দন দাস-এর মডেল ফার্ম

প্রবীর মাইতি

পশ্চিমবঙ্গের উনিষটি জেলায় মধ্যে দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলাটি অন্যতম। অন্যতম এই অর্থে যে, পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ 'সুন্দরবন' যেমন এই জেলার অন্তর্ভুক্ত তেমনি ভারতবর্ষের বড় বড় শহর গুলির মধ্যে তার ভৌগলিক সীমা বৃদ্ধি করেছে বা বলা যায় এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা হল 'বৃহত্তর কোলকাতা'-র প্রবেশদ্বার। একদিকে এই জেলারই সুন্দরবন যেমন 'বিশ্ব হেরিটেজ সেন্টার'-এর মর্যাদা পেয়েছে তেমনই এই জেলারই কাকদ্বীপ মহকুমার সাগরদ্বীপ ভূখন্ডের মধ্যে গঙ্গাসাগর তীর্থক্ষেত্র ভারতবর্ষের তীর্থভূমির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থভুমি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কাকদ্বীপ মহকুমার অন্তর্গত আনুমানিক তিনশ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি এই সাগরদ্বীপ ব্লকটিতে প্রায় দুলক্ষ মানুষের বাস। এদের প্রধান জীবিকা মূলতঃ

কৃষিকাজ আর সম্পূর্ণ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া। কৃষিকাজের মধ্যে মোট জমির প্রায় নব্বই শতাংশ জমিতে পান ও ধানের চাষ হয়। বাকী দশ শতাংশ জমিতে সব্জীও অন্যান্য চাষ হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের এই কৃষিপ্রধান দ্বীপটি বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক বিপর্যের সম্মুখীন হয়েছে। দ্বীপটিতে বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। দ্বীপটিতে বসবাসের পর থেকে এতবার মানুষগুলির জীবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে যে, আর্থিক ভাবে কোনদিনই এই দ্বীপের মানুষ শক্ত জমি পায় নি। সর্বশেষ বিপর্যয় 'আইলা' এমনই এক ভয়ংকর উদাহরণ।

নিয়ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে করতে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ছেন সাগরের মানুষ। সবচেয়ে ভেঙে পড়ছেন সেই সমস্ত চাষীবন্ধুরা, যাঁরা সবুজবিপ্লবের পর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে একসময় উন্নতমানের প্রচুর ধান ও পানের ফলন পেয়েছেন। আজ সেই ফলন পরিণামে ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। আবার বিপর্যয়ের ফলে চাষের জমিতে সমুদ্রের লোনা জল ঢুকে গিয়ে জমির ফলন আরও কমে যাচ্ছে। ঠিক এইরকম জটিল সময়ের মধ্যে সাগরদ্বীপের চাষীদের চাষের কাজে এক নতুন দিশা দেখানোর উদ্যোগ নিয়েছে কোলকাতার পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ।

গত দু'বছর ধরে সাগর ব্লকের প্রায় পনেরটি গ্রামের পঞ্চাশটির মত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর একশজনেরও বেশি চাষীদের নিয়ে একটি ব্যতিক্রমী পরীক্ষা চালিয়ে অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখল 'পরিবেশ উন্নয়ণ পরিষদ'। একটি উদাহরণ দিয়েই সমস্ত ঘটনা বিবৃত করা হল।

কাকদ্বীপ মহকুমার সাগরদ্বীপ ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রামের বছর পঁয়তাল্লিশের চন্দন দাস একজন অভিজ্ঞ চাষী। চাষের জমি বলতে বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে এককাঠা আন্দাজ পানের বোরজ আর পূর্ব দিকে এক চিলতে ডাঙা জমি। অন্য সম্পত্তির মধ্যে দু'কামরা খড়ের ছাদ দেওয়া মাটির ঘর যে কামরাদুটিতে চন্দনবাবু তাঁর পরিবার নিয়ে বাস করেন। পরিবারে তিনি ছাড়াও তাঁর স্ত্রী, একটি কন্যা সন্তান ও দুটি পুত্র সন্তান তাদের ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করতে হয়। শুধু তাই নয় তাঁর তিনটি সন্তানই পড়াশুনা করে। এদের মধ্যে ছোট ছেলেটি সপ্তম শ্রেণীতে পড়লেও অন্য দু'জনের তুলনায় পড়াশুনা একটু বেশি ভালো ও সিরিয়াস। তাই তার জন্য বিশেষ কিছু সুযোগের ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে করে চন্দনবাবুর। পাশেই একটি গোয়ালঘর যাতে দুটো গরু থাকে। আর শোবার ঘরে দক্ষিন দিকে উঠান পেরিয়ে কয়েকফুট দূরে একটি কাঠা তিনেক অগভীর পুকুর, যাতে সারাবছর জল থাকে না। ফলে মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল থাকত না। তাই চন্দনবাবু পুকুরে মাছ ছাড়লেও পুকুর সংস্কারের অভাবে মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হোত না। ফাঁকা উঠোনে লাউ, শশা, কুমড়ো, পেঁপে বা ঢেড়স গাছের দু'চারটে বীজ পুঁতে দিতেন। অভিজ্ঞ, নিত্য নতুন চাষে উৎসাহী এবং সাহসী এই মধ্যবয়সী চন্দনবাবু চাষে ক্রমষ লাভ কমতে থাকায় চাষের উপর আর নির্ভর না করে সংসারে স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে এখন অন্যের জমিতে মজুর খেটে অথবা পানের নৌকায় নদীতে খালাসীর কাজে যেতে হয় অতিরিক্ত আয়ের আশায়।

পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ এই অভিজ্ঞ উৎসাহী এবং সাহসী মানুষটি ও তাঁর জমিতে বেছে নিল পরীক্ষামূলক বিকল্প চাষের জন্য। ''বিকল্প চাষ'' কে পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ ''সুসংহত পদ্ধতিতে চাষবাস'' (Integrated Firming) এই নামে অভিহিত করেছে। অর্থাৎ যে চাষে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হবে, একই সঙ্গে একই জমিতে অন্ততঃ পক্ষে চার থেকে পাঁচটি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জল সাশ্রয় ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে, ফসল হবে গতানুগতিক চাষের তুলনায় বেশি এবং পরিবেষ দূষণ রোধ সর্বোপরি চাষীর আর্থিক দিক থেকে জীবনের মান হবে পূর্বের তুলনায় স্বচ্ছল ও ঊর্দ্ধমুখী।

এবার চাষের কথায় আসা যাক। পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ চন্দনবাবুর এই আর্থিক অবস্থা দেখে এবং চাষের কাজে উৎসাহী দেখে চন্দনবাবুকে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল করার লক্ষ্যে তাঁকেই নির্বাচন করে নিল। প্রথমে ওই পুকুরটি সংস্কার করার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা চন্দনবাবুকে দেওয়া হল। সংস্কার করার জন্য মোট খরচ হল ৩৫০০ টাকা।এই টাকার তিনি ৩৭ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩০ ফুট প্রস্থের পুকুরটি মাটি কেটে বা গভীর করে নিলেন। মাটিটাও পরিকল্পনা করে তোলা হল। প্রথমত, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাপ অনুযায়ী পুকুরের মাটি চার ফুট গভীর করে খনন করে যতটা সম্ভব মাটি তুলে নেওয়া হল। ফলে একদিকে পুকুর গভীর হওয়ার ফলে যেমন পরিমাণে বেশি এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ছাড়া যাবে। অন্য দিকে তেমনি ওই উঁচু পাড়ে হরেক রকমের সব্জি চাষ করা যাবে। চন্দনবাবু এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন। তিনি রুই, কাতলা, মৃগেল, ভেটকী, কৈ, মাগুর, ল্যাঠা, শোল, চিংড়িসহ নানান প্রজাতির মাছের চারা পুকুরে ছেড়ে দিলেন। অন্যদিকে পুকুরের চারপাশের উঁচু করে যে মাটি ফেলেছিলেন, সেই পাড়গুলিতে নানান সব্জী চাষ করলেন। যেমন পূর্ব পাড়ে চিচিঙ্গা, ঢেঁড়স, লঙ্কা ও ঝিঙে; পশ্চিমপাড়ে ঢেঁড়স, তিলও লাউ; উত্তরপাড়ে কুমড়ো, চিচিঙ্গা ও কলা আর দক্ষিণ পাড়ে পুঁই করলা ও ঝিঙে চাষ করলেন। এই চাষের ক্ষেত্রে আবার উল্লেখয়োগ্য যে বিষয়টি তা হল, চন্দনবাবু এই চাষে মাটি তৈরি থেকে সব্জী গাছ কোন ক্ষেত্রেই রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করেন নি। পরিবর্তে কেঁচোসার জৈবসার ও সবুজ সার প্রয়োগ করেছেন। এবং ওই সার গোয়ালঘরের পাশের সামান্য জায়গাতে নিজেই তৈরি করেছেন কেঁচোসার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো।

যখন সব্জীগাছগুলি দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠতে লাগল, তখন পুকুরের চারদিকে নাইলন দড়ি দিয়ে মাচা করে দিলেন। ফলে একদিকে বড় গাছগুলি ওই দড়ি বেয়ে নিজেদের জায়গা করে নিল (যেমন কুমড়ো, লাউ, ঝিঙে, চিচিঙ্গা গাছগুলি)। অন্যদিকে পুকুরের জল গ্রীষ্মকালে যে অধিকমাত্রায় গরম হয়ে যেত, বর্তমান ওই দড়ির মাচায় অজস্রগাছের পাতা ও কান্ড তৈরি হওয়ায় জলে ছায়ার সৃষ্টি হতে লাগল। ফলে পুকুরের জল গরম কম হতো আর মাছেরা গরম জলের হাত থেকে রক্ষা পেত।

এরপর ওই পুকুরে চন্দনবাবু ৬ টি হাঁস চাষ করলেন। হাঁস চাষের যুক্তি হল হাঁসগুলি বিচরণের জন্য যেমন পুকুর বা জলাশয়ের প্রয়োজন পুকুরে হাঁস বিচরণ করলে মাছেরা জলের নীচে খেলে বেড়ায়। এতে মাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। অবার হাঁসের বিষ্ঠা মাছ খেয়ে বেড়ায়। এতে মাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। আবার অন্যদিকে হাঁসের মালিক একদিকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হাঁসের ডিম পান যা তিনি নিজে খেতে পারেন অথবা বিক্রয় করতে পারেন। আবার উপযুক্ত সময়ে হাঁস বিক্রি করে তার থেকেও আয় করতে পারেন।

ম্যানগ্রোভের পুনর্জন্ম

মমতা পণ্ডিত

কোলকাতার পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ আমাদের সাগরদ্বীপের পনেরটি গ্রামে গ্রামেরই চাষীভাই, একাধিক স্ব-সহায়ক দল, শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ট্রেনিং দিচ্ছে। সেই সঙ্গে গ্রামের আর্থিক মনোন্নয়নের জন্য 'আমার গ্রাম' প্রকল্প নাম দিয়ে নানান বিষয়ের ওপর ট্রেনিংপ্রাপ্ত সদস্য-সদস্যাদের কাজে লাগাচ্ছে। যেমন— দেশজ বীজ সংরক্ষণ, কেঁচোসার, জৈবসার উৎপাদন, নার্সারী তৈরি প্রভৃতি। এই কাজে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছে বামনখালির সাগরব্লকের S. R. S.। মুড়িগঙ্গা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কশতলা গ্রামে আমার বাস। আমি দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতাম না। যখন 'আমার গ্রাম' প্রকল্পের কথা বিস্তারিত জানলাম, তখন আমার অন্যান্য সিনিয়র জুনিয়র বন্ধুদের মত আমিও এই প্রকল্পে যোগ দিলাম। কিন্তু সেভাবে নতুন কিছু করার উৎসাহ পাইনি।

কয়েক মাস আগে বিধ্বংসী আয়লা সুন্দরবন অঞ্চলের একাধিক গ্রামকে সর্বশান্ত করেছে। তাই সরকার, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দুর্গতদের নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। আমাদের যৌথ পরিবার। পরিবারের বড় দাদা আটত্রিশ বছর বয়সী দুলাল পণ্ডিত ভূতল পরিবহনের স্টিমারে চাকরি করেন। সেইসূত্রে দাদা বিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে ত্রাণ পৌঁছতে যেতেন। একদিন সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা যখন বাড়িতে এসে বলছেন আমিও পরিবারের অন্যদের সঙ্গে বসে শুনছিলাম। দাদা অনেক কথার মাঝে বলছিলেন যে, একটা সময় দেখতে পেলেন নানান ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের যেমন মধুমনী, হেঁতাল, সুন্দরী ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজ তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছিল। পরিবেশ উন্নয়ন

পরিষদ আলোচনায় বারবার গুরুত্ব দিয়ে বোঝাচ্ছিল দেশজ উদ্ভিদ বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা কতটা, যা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পরে আমি দাদাকে বলি যে, তিনি যেন ওই বীজ সুযোগ পেলে আমার জন্য সংগ্রহ করে আনেন। তিনি একদিন প্রায় দু'বস্তা বীজ সংগ্রহ করে এনেও দিলেন। আমি আমার মা ও কাকিমার সহযোগিতায় একটি জমিতে বীজগুলিকে বাব-কাকা-দাদাদের পরামর্শ মত লাগালাম। নিয়মিত পরিচর্যায় কিছুদিন পর দেখি বীজ থেকে চারাগাছ আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাচ্ছে। এই দেখে আমার আনন্দের সীমা নেই। পাড়ার ও স্কুলের কোনো কোনো বন্ধু অবশ্য আমার এই কর্মকাণ্ডকে 'পাগলামি' বলে হাসি ঠাট্টা করছে। তবুও প্রায় ২৫০টি বীজে প্রাণ দিতে পেরে আমি এক আলাদা গর্ব অনুভব করলাম। তারপর ভাবলাম যেখানে যেখানে নদীর পাড় ভেঙে গেছে, ফাঁকা পতিত জায়গা পড়ে আছে, সেইসব জায়গায় যদি এই চারাগুলি রোপণ করা যায়, তাহলে একদিকে যেমন নদীর পাড়ের ক্ষয় রোধ করা যাবে, তেমনি দেশজ সম্পদের বৃদ্ধি ঘটবে। তাই ঠিক করেছি আমাদের পঞ্চায়েত দপ্তরে, স্থানীয় ক্লাব বা পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদকেও আবেদন করব যাতে চারাগুলি লাগানোর সুব্যবস্থা করে। ওরা বাঁচুক, ওরা বড় হোক। তাহলে ওরাই একদিন ক্ষুধার্তকে দেবে ফল আর তাপিতকে দেবে ছায়া।

সুস্থায়ী চাষবাসে স্বপনদার হাত ধরে আমরা

সুতপা দাস

গ্রামে আর পাঁচটা পরিবারের মতো স্বপনদার পরিবারেরও বাস। দুধে ভাতে না খেলেও নুন আনতে পান্তা ফুরায় না। ওদের কাঠা দশ জায়গার মধ্যে একটা পুকুর ছিল। স্বপনদা মরসুমী সবজী চাষ করতে ভালো বাসেন। কিন্তু জায়গা টি খুব বড়ো নয়, ইচ্ছা থাকলেও জায়গার অভাবে সব ধরণের মরসুমী ফসল চাষ করতে পারত না। তাই মনে একটা ক্ষোভ ছিল।

একদিন 'আমার গ্রাম' প্রকল্পের প্রতিনিধির সঙ্গে স্বপন দার পরিচয় হল। তিনি বললেন যে সামান্য জায়গায়ও অনেক কিছু করা যায়। পুকুর পাড়ে ঘর তৈরী করে মুরগী, জলে মাছ ও হাঁস একসঙ্গে চাষ করা যায়। একথা তিনি বিশ্বাস করেন নি। এমন কি পাড়ার অন্য কেউও বিশ্বাস করেনি। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, মানুষ হয়ে মানুষকে বিশ্বাস করবো না, একটু করে দেখি। এই ভেবে সংস্থার প্রতিনিধির পদ্ধতি মতো কাজ করতে রাজী হলেন। এবং কাজ করতেও লাগলেন। পুকুরে জলের তলায় মাছ উপরে হাঁস ও তার উপরে মাচা করে মুরগী করলেন। পুকুরের আলে মাচা করে লতা জাতীয় গাছ, তার নিচে গুল্ম জাতীয় গাছ করতে লাগলেন। গরু ছাগলের থেকে বাঁচানোর জন্য জীবন্ত বেড়া সুবাবুল, মাদার গাছ দিয়ে তৈরী করলেন। এই গাছ গুলো সবজীর কোন ক্ষতি করবে না ও এই বেড়া কাটিং করার পর কাটা ডালপালাগুলি জ্বালানী ও গোরু ছাগলের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। শুধু সবজীচাষ করলে তো হবে না, এর সমস্যা গুলোর সমাধান করা জানতে হবে। সমস্যা বলতে রোগ প্রতিরোধ বা কোন ঋতুতে কোন ফসল চাষ করা হবে এটা ও ওই প্রতিনিধির কাছ থেকে জানলেন। রোগ প্রতিরোধের জন্য কেরোসিন সাবান দ্রবণ, তরল সার, গোবর দ্রবণ, এবং সার হিসাবে জৈব সারের ব্যবহার মেনে নিলেন। স্বপনদা অবাক হয়ে গেলেন আমাদের চারপাশের সম্পদ দিয়ে এইসব সার ঔষধ তৈরী করা যায় জেনে। সম্পদ বলতে লতাপাতা, সব্জীর খোসা, ছাই গোবর, গোমূত্র ইত্যাদি তৈরী করা যায় এবং এই সব করতে কোন অর্থের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মাটির ও প্রাণীর সুরক্ষার জন্য এগুলো প্রয়োজন।

কিছুদিন পর এইসব পদ্ধতি প্রয়োগ করার ফল পেয়ে গেলেন।

আজ তিনি এই চাষ পদ্ধতি নিজে অবলম্বন করেছেন এবং অন্যকে করতে সাহায্য করছেন।

আর স্বপন দার কোন ক্ষোভ নেই কারণ তিনি সামান্য পরিমাণ জমিতে সব কিছু করতে পারছেন বলে। তিনি এখন স্বীকার করছেন এই সামান্য জমিতে ফসল ফলিয়ে তাদের পাঁচজনের (সদস্য) সংসার ভালো ভাবে চলে যাবে আর অন্য পথে রোজকারের কথা ভাবতে হচ্ছে না। তিনি এও বলেছেন তার এই এগিয়ে যাওয়া আমার গ্রাম প্রকল্পের এর জন্য সম্ভব হয়েছে।

কেবলমাত্র 'আমার গ্রাম'-এর সদস্য ও সমর্থকদের জন্য প্রকাশিত। বিনিময় মূল্য- দুই টাকা।

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ: বর্ণনা, ৬/৭, বিজয়গড়, কোলকাতা: ৭০০ ০৩২, ফোন: ৬৪৫১ ৩৩৪২, ৩২৯৬ ৯৭২৫